BBA VISION

Course Name: History

*****IMPORTANT QUESTIONS*****

Board Questions + Test Questions

1ST YEAR 7 CLG + NU

Topic: Undivided sovereign Bengal(অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র)

Chapter: 02

১) সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে?

সাম্প্রদায়িকতা (ইংরেজি: Communalism) হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন চেষ্টা করে।সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি কোন জনগোষ্ঠী নিজ স্বার্থকে তাদের ধর্মীয় দলগুলোর স্বার্থের সাথে অভিন্ন মনে করার প্রবণতা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আর এ প্রবণতায় একটি জনগোষ্ঠী অন্য ধর্মের জনগোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-আজরণ ও মূল্যবোধকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ফলে এ প্রবণতা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে

যে গোষ্ঠী চেতনা বৃহৎ সমাজকে পাশ কাটিয়ে, ক্ষুদ্র গোষ্টিগত স্বার্থে অন্য ধর্ম, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কেবল বিরোধিতাই নয় বরং অন্যের অধিকার দিতে অস্বীকার করে এবং ক্ষতি করতে করতে নিযুক্ত থাকে। পাশাপাশি যে চেতনা বা বিশ্বাস অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য জাতির ঐতিহাসিক ও সম্মানিত চরিত্রকে হীন বা বিকৃত রূপে উপস্থাপন করতে নানাবিধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে তাকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে।অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানোও সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত। যে বা যারা এই চেতনার লালন, পালন, বাস্তবায়ন ও প্রচার চালায় তারাই সাম্প্রদায়িক।" সাম্প্রদায়িকতা বলতে সাধারণত ধর্মের নামে ধর্মাতিরিক্ত লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করাকে বুঝায়। এরূপ সাম্প্রদায়িকতা সম্পন্ন কোন সম্প্রদায় ধর্মকে ধর্মান্ধতায় রূপান্তরিত করে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাই সাম্প্রদায়িকতা শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্পন্ন লোকেরা মনে করে যে, তাদের ধর্মের লোকদের সকল স্বার্থ অভিন্ন এবং তা অন্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক। এসব লোক ধর্মীয় বিশ্বাসকেই সমাজ ও রাজনীতির ভিত্তি বলে মনে করে। সুতরাং, কোন ধর্মের নামে যখন ধর্মাতিরিক্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার ও অসৎ ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে।

২) লাহোর প্রস্তাব কি এর বৈশিষ্ট্য ?

লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব, যাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণাও বলা হয়, তা হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনা।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয় । মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ । ১৯৩০ সালে কবি আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য

BBA VISION

আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৩ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কণ করেন। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়।

এই চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ-

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

২. এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ" প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি না থাকলেও এটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবে কার্যত ভারতের সন্নিহিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে 'দিল্লি মুসলীম লেজিসলেটরস কনভেনশন'-এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র- পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও বাকি অংশ নিয়ে ভারত ইউনিয়ন।

১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব' ও জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' পাকিস্তান সৃষ্টির মূলভিত্তি ছিল। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশ প্রায় এক হাজারের অধিক মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানি বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা মনে করত, তাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত এবং তাদের ধমনিতে রয়েছে অভিজাতের রক্ত। এই ধরনের মানসিকতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের অবহেলার চোখে দেখত।

ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শাসনকালে বাঙালিদের অবস্থা ছিল অনেকটা নিজ দেশে পরবাসীর মতো। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

৩) ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

BBA VISION

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তথা মুসলমানদের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে যে কয়টি ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে তার মধ্যে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অন্যতম। এটি ছিল অনুন্নত মুসলমান সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের এক অপূর্ব চাবিকাঠি। বিশেষ করে লাহোর প্রস্তাবেই মুসলমানরা সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধভাবে জোড়ালো কণ্ঠে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি তথা স্বাধীন স্বার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি জানান এবং তাদের এই স্বতন্ত্র চিন্তাধারা অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকের জন্য হুমকিস্বরূপও ছিলনা। পরবর্তীতে লাহোর প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে ।

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু :

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সন্নিহিত স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

(খ) এসব অঞ্চলকে প্রয়োজন মতো সীমা পরিবর্তন করে ' এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলসমূহে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় ।

(গ) স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এ * অধিবেশনের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর করা যাবে না বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি তা নিম্নরূপ মূলনীতির উপর পরিকল্পিত না হয় ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় : "এসব অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত কার্যকরি ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে করতে হবে। ভারতবর্ষে মুসলমানগণ যেসব স্থানে সংখ্যালঘু সেসব স্থানে তাদেরও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত কার্যকরি ও বাধ্যতামুলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র করতে হবে।"

→ লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সকল দিক থেকে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা লাহোর প্রস্তাব পরবর্তীতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. রাজনীতিতে নতুন ধারা : ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। এতদিন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দুটি রাজনৈতিক দল থাকলেও সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হত এক পক্ষীয়ভাবে । কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতের রাজনীতি সমানভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । যার ফলে রাজনীতি নতুনভাবে অগ্রসর হয়।

২. মুসলিম ঐক্যবোধ সৃষ্টি : লাহোর প্রস্তাবের ফলে মুসলিম ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এতদিন হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর মিলে-মিশে চলত এবং নিজেদেরকে একই জাতীয়তাবোধের অধীন বলে মনে করত। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিম ঐক্যবোধের সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং ইসলাম ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ তৈরি করে ।

৩. মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি : লাহোর প্রস্তাবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ব্যপক হারে বৃদ্ধি পায়। এতদিন অনেক মুসলমান ও কংগ্রেসের অধীনস্ত ছিল কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলমানদের নিকট কংগ্রেস হিন্দুদের দল এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হয় । যার ফলে সকল মুসলমানই মুসলিম লীগের ছায়াতলে আসন নেয় ।

৪. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রভাব : ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে লাহোর প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কেননা এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ মোট ৪৯২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৮ টি আসন লাভ করে। অথচ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের আগে মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মাত্র ১০৯টি আসন লাভ করে ।

৫. ভারত স্বাধীনতা আইন পাস : লাহোর প্রস্তাবের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থগত চরমাকারে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার অনুধাবন করতে পায় যে, ভারতবর্ষের বিভক্তি ছাড়া সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ নেই। তাই লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করা হয় ।

৬. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম : সকল বন্ধন ছিন্ন করে ও সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যার ফলে লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি বাস্তব রূপ লাভ করে । মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করে।

BRAVISION

৭. **নবদিগন্তের সূচনা** : ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এক নবদিগন্তের সূচনা করে। কেননা এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ তার হাজার বছরের ইতিহাস ছিন্ন করে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় ।

৮. **স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপন** : আজকে আমরা যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বসবাস করছি তারও স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয় ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে। কেননা লাহোর প্রস্তাবে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয় পরবর্তীতে স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালিরা তারই ভিত্তিতে আন্দোলন করে এবং এই ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাভ করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

৯. **স্বাধীন বাংলার বীজ বপন** : লাহোর প্রস্তাবই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বাপন করেছিল । কেননা লাহোর প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তবে পরবর্তীকালে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একাধিক জায়গায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয় । কিন্তু বাংলার মুসলমানরা সর্বদাই লাহোর প্রস্তাবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন করতে থাকে । নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা হয় বাংলার স্বাধীনতা আনেকাংশে লাহোর প্রস্তাবেরই ফল ।

৪) লাহোর প্রস্তাবের ফলাফল লিখ।

১. মুসলিম প্রতিক্রিয়া : লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপোষ ও অনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলমানদের ধ্যান ধারণার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। মুসলমানরা এখান থেকেই অনুভব করেন যে তাদের সাংবিধানিক নিরাপত্তার দরকার নেই। তারা সাংবিধানিক নিরাপত্তার পরিবর্তে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের দাবি জানায় ।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক । নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফলতা লাভ করে। তারা ৪৯২টি ধ মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৮টি আসন লাভ করে এবং এই নির্বাচনের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসেবে পালন করে। এককথায় মুসলমানরা মনেপ্রাণে নিজস্ব রাষ্ট্রের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

২. হিন্দু প্রতিক্রিয়া : হিন্দুদের জন্য লাহোর প্রস্তাব নেতিবাচক ন ফলাফল নিয়ে আসে। কেননা হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবকে মনে প্রাণে ব মেনে নিতে পারেনি। গান্ধীজী মনে করেন লাহোর প্রস্তাব মেনে ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করা হবে যা অত্যন্ত পাপের কাজ।

জওহরলাল নেহেরু তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "লাহোর প্রস্তাব স মেনে নিলে ভারত হয়ে পড়বে বলবান রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় ছোট না ছোট কর্তৃত্ববাদী পুলিশ রাষ্ট্র"। মুসলিম লীগ প্রস্তাবগুলো এই প্রস্তাবকে স "পাকিস্তান প্রস্তাব" বলে সমালোচনা করেন। এক কথায় হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালান ।

৩. ভারতের বিভক্তি : লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ভারত বিভক্তির পথ অনেকটাই সুগম হয়ে যায়। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মূলত অখণ্ড ভারতের জন্য যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে ছিলেন। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে তার ছেদ পড়ে। ব্রিটিশ সরকার ও লাহোর প্রস্তাবের ফলে উপলব্ধি করেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের কে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় রাখা হবে নির্বুদ্ধিতার শামিল । অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাব অখণ্ড ভারতের ধারণায় ব্যবচ্ছেদ ঘটায় ।

৪. হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট : যদিও ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মৌলিক। তবুও হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ভাবে অখণ্ড ভারতের । স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে অসামান্য। এই প্রস্তাব আন্দোলনরত মুসলমান জাতির মধ্যে এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। তাই বলা যায় যদি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত না হতো তাহলে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ রাষ্ট্র শুধু কল্পনাই থেকে যেত ।

BA VISION

৫) দ্বিজাতি তত্ত্ব কাকে বলে?

দ্বিজাতি তত্ত্ব হল এমন একটি মতাদর্শ যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র তাদের ধর্মের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমান এবং হিন্দু দুটি স্বতন্ত্র জাতীয়তার পরিচয় দেয়া হয়েছে, এবং যেখানে ভাষা, বর্ণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্টের তুলনায় ধর্মকে বেশি প্রধান্য দেয়া হয়েছে। ১৯৩৯ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান নামে দুটি আলাদা জাতির প্রস্তাব করেন। স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে ঘোষণা করে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব আনেন তাই ইতিহাসে দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত।

ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারতকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রাক্কালে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের এ ধারণার উন্মেষ ঘটান। মতবাদটির একটি নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের পর্যায়ক্রমিক সাংবিধানিক সংস্কার আইনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় মুসলমানগণ প্রাদেশিক আইনসভা এবং আইন পরিষদের জন্য ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার রাখত। এর ফলে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে মুসলিম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পরেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভাবোদয় হয় যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুফল দ্বারা দুটি পৃথক জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদ্রেক সম্ভব যাকে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' অভিধায় আখ্যায়িত করা যায়। কারণ, ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবেই পৃথক একটি জাতি গঠন করতে সক্ষম।

মুসলমানদের একটি জাতি হিসেবে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে উদ্‌বুদ্ধ করতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৯৮) প্রথম এ ধারণার উন্মেষ ঘটান। তিনি ভারতের মুসলমানদের কংগ্রেস দলের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসাতে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি প্রচার করেন যে, ভারতীয় মুসলিম তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় একটি জাতি গঠন করবে এবং স্বশাসনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের জোটবদ্ধ হওয়া উচিৎ হবে না। তাঁর এ ধারণা উপনিবেশিক শাসকদের সমর্থন লাভ করে। কারণ ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার নিয়ন্ত্রনের জন্য শাসক পক্ষের যেকোন একটি দলের সমর্থন লাভের প্রয়োজন ছিল।

প্রাদেশিক পর্যায়ে সাংবিধানিক কুশাসন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কংগ্রেসের অসহযোগী মনোভাব কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে বেশ সংখ্যক মুসলিম রাজনৈতিককে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং এর ফলে যে মুসলিম লীগ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল, তাই দিনে দিনে বাংলায় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের রাজনীতির বাহকে পরিণত হয়। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ও দার্শনিক স্যার মুহাম্মদ ইকবাল দ্বিজাতিতত্ত্বের তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেন। মুসলিম প্রতিনিধিত্ব দলের মনোভাবকে লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিয়াশীলবাদের উপর ভিত্তিশীল বলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে মন্তব্য করেন তার প্রতিবাদে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল বক্তব্য দিতে গিয়ে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন

৫) লক্ষ্ণৌ চুক্তি কী?

ভারত উপমহাদেশের সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানদেরকে ক্ষুব্ধ করে গেলে। অগ্রগতির ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ – পদক্ষেপ। ১৯১৬ সালে বোম্বাই অধিবেশনে সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের (**ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল। এই দল সাধারণভাবে কংগ্রেস নামে পরিচিত। কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলদুটির একটি (অপর দলটি হল ভারতীয় জনতা পার্টি)**। এটি একটি ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন।) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিই লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে খ্যাত।

→ লক্ষ্মৌ প্যাক্ট/লক্ষ্মৌ চুক্তি : প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলেও ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় ভারতে রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১৪ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ভারতীয় মুসলমানদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অপরদিকে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করে।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানদের অসন্তোষ এ দুটি সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রেক্ষিতে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যৌথভাবে এক সভায় মিলিত হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষর করে, ঘা লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে খ্যাত। এ চুক্তি সম্পাদনে সর্বভারতীয় মুসলি লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভূমিকা ছিল অনন্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলমানদের ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠর ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী পদক্ষেপ। এর ফলেই মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৬) লখনৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য লেখ?

১৯১৬ সালে লখনউতে দুই দলের যৌথ অধিবেশনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের সদস্য হিসেবে দুই দলকে চুক্তিতে উপনীত করাতে সক্ষম হন যাতে ব্রিটিশ সরকার ভারত পরিচালনার জন্য উদারপন্থা গ্রহণ করে ও পাশাপাশি মুসলিমদের দাবিগুলোও রক্ষিত হয়।

মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের নীতি মেনে নেবে। অন্যদিকে কংগ্রেসও মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনের নীতিকে স্বীকৃতি জানাবে।

ii) প্রতিটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক – তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন মুসলিম প্রতিনিধি।

iii) মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সদস্যরা যৌথ ভাবে স্বরাজ আদায়ের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

iv) উভয় দলই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট দিন, তারিখ প্রভৃতি ঘোষণার দাবি জানাবে।

v) ভারত কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে এবং ভারতে স্বায়ত্তশাসিত সরকার থাকবে।

vi) গভর্নরের নির্বাহী কাউন্সিলে একই প্রক্রিয়া প্রয়োজ্য।

vii) আইন সভার মেয়াদ হবে ৫ বছর।

৭) অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ?

অখণ্ড বাংলা গঠনে যেসব মূলনীতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো। উপমহাদেশের সকল বাঙালিকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভিন্ন বাংলা গঠনের প্রয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন বাংলা' পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে এ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ছিল বাংলায় একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে, যার প্রধানমন্ত্রী হবে মুসলমান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ প্রস্তাবে তৎকালীন পার্লামেন্টের অনেকেই সাড়া দেয়। এ অখণ্ড

BA VISION

বাংলার প্রস্তাবে মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ বিরোধিতা শুরু করে। তারা লাহোর প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে পত্রিকায় সোহরাওয়ার্দীর ও হাশিম গ্রুপের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার শুরু করে। নিম্নে অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াসে নানারকম পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

পাকিস্তান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে হলেও বাংলার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাধীন অখণ্ড ন বাংলা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অখণ্ড বাংলা গঠনে যেসব মূলনীতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

- **উপমহাদেশের সকল বাঙালিকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।**
- **বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।**
- **উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।**
- **ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।**
- **ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বাঙালি জাতির মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে।**
- **বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতারা উপমহাদেশের সকল বাঙালিকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য উদ্যোগ নেন।**
- **অখণ্ড বাংলার পক্ষে জনমত গঠন ও প্রচারণা চালানো।**
- **ভারত ও পাকিস্তানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অখণ্ড বাংলা গঠনের সম্ভাবনা যাচাই করা।**
- **অখণ্ড বাংলা গঠনের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম গড়ে তোলা।**
- **অখণ্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ সফল হয়নি।**
- **ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়।**
- **অখণ্ড বাংলা গঠনের আন্দোলন বাঙালি জাতির মধ্যে স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ ঘটায়।**

৮) ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির কারণ ও ফলাফল লিখ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করে। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হয়েছিল পূর্বেকার বিভাগ অনুসরণ করেই। তবে এ বিভাগ হয়েছিল মূলত হিন্দু মুসলিম জনমত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে একটি অখন্ড রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হন। ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

→ ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির কারণ : নিম্নে ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তির কারণ তুলে ধরা হলো-

১. প্রাধান্য সৃষ্টি : ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় যে কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি নির্বাচনের পর কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়েছিল। এসব কোয়ালিশন সরকারে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রাধান্য ছিল। এতে হিন্দুদের মধ্যে অনেক অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল । ফলে হিন্দুদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয় যে বাংলা অবিভক্ত থাকলে সেখানে মুসলমানদের আধিপত্য থাকবে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে শংকা ছিল যে বাংলা অখন্ড ভারতের অঙ্গীভূত হলে সেখানে হিন্দুরা আধিপত্র বিস্তার করবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতিবাচক ধারণার কারণে বাংলা বিভক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা : ১৯৪৭ সালের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা বাংলা বিভক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার পরিকল্পনায় বাংলা বিভক্তির বিস্তারিত আলোচনা কার্যক্রম ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এসবের মধ্যে বাংলায় হিন্দু অধ্যুষিত ও মুসলিম অধ্যাষিত এলাকায় - আলাদাভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করা হয়।

BBA VISION

৩. **গণপরিষদের রায়** : ১৯৪৭ সালের ৩ জন পরিকল্পনা * অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্তে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন গণপরিষদে বেশ কয়েক দফা ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রথমে গণপরিষদের সদস্যরা ১২৬-৯০ ভোটের ব্যবধানে ভারতের গণপরিষদে বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্তের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গণপরিষদ সদস্যসমূহ পৃথক বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা বিভক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করন এবং পাকিস্তানের নতুন পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহের গণপরিষদে সদস্যগণ ৫৮-২১ ভোটে বাংলা বিভক্তির বিপক্ষে রায় দেন।

৪. **সংখ্যা সাম্যতত্ত্বের বিরোধিতা** : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র জীবনের পরিকল্পনা করেন। তিনি চাকরি ও জনপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বাংলায় সংখ্যা সাম্য প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সংখ্যা সাম্যকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এ কারণে হিন্দুদের সংখ্যাসাম্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সংখ্যা সাম্যের বিরোধিতা ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল।

৫. **সর্বভারতীয় বাঙালি নেতার অভাব** : দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একজন বিখ্যাত বাঙালি নেতা ছিলেন। তার মৃত্যুর পর যোগ্যতা সম্পূর্ণ কোনো নেতা ভারতে ছিলেন না। এ কারণে ভারতে নেতৃত্ব বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে। এতে করে বাংলা বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে ।

৬. **সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা** : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ২৬ জন জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ৬ জন বাঙালি ছিলেন কিন্তু ১৯১০- ১১ সালের পর চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া ভিন্ন আর কোনো বাঙালি পাওয়া যায়নি। সুভাষচন্দ্র দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হলে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগিতার কারণে তিনি ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তি ও নেতৃত্ব দুর্বলতার কারণে তার কাছ থেকে তেমন ভালো কিছু আশা করা যায়নি।

৭. **একে ফজলুল হকের অপরিনামদর্শিতা** : বাংলায় মুসলমান সমাজে ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে মধ্যবিত্ত অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর বাঙালি মধ্যবিত্ত থেকে ফজলুল হক বের হয়ে আসেন। তিনি অত্যন্ত বড় মাপের নেতা ছিলেন। তবে তাকে তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই রাজনীতি করতে হয়েছিল। তার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ছিল না বসলেই চলে ।

৮. **বাঙালি নেতৃত্বের অভাব** : বাংলায় বাঙালি নেতৃত্বের অভাব ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগের একটি অন্যতম কারণ ছিল। এ সময় মুসলমান নেতাদের মধ্যে অনেকেই বাংলায় ছিলেন কিন্তু বাঙালি ছিলেন না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিম উদ্দিনের অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একই খাটি বাঙালি ছিলেন না। বাংলা তাদের ভাষা ছিল না। তাই বলা যায় বাংলা বিভক্তির প্রকৃত বাঙালি নেতার অভাব ছিল ।

১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির ফলাফল : ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তির ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কারণ বাংলা ভাগকে মুসলমানরা দাবি করেছিল তাদের বিজয় হিসেবে এবং তারা বহুদিনের আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূরণে আনন্দের জোয়ার ভাসছিল । অন্যদিকে ভারতীয় হিন্দু ও আবুল কালাম আজাদের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী মুসলিমদের মনভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যদি ও ব্রিটিশরা মনে করেছিল যে ভারত বিভক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসন হবে। কিন্তু ভারত তথ্য বাংলা বিভক্তির পর পরই দেখা যায় পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা যা ভারত পাকিস্তান সম্পর্ককে আরও নাজুক করে দেয়। যা দীর্ঘমেয়াদি অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ব্রিটিশরা ভারতকে ভাগ করার সময় কিছু বিষয় অমীমাংসিত অবস্থায় রেখে যায় যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার উদ্ভব হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার কারণে এসব অঞ্চলের মানুষের মনে নিজ জাতিসত্তা ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষোভ দানা বাধে। যার ফলে এ অঞ্চলের মানুষ অন্য জাতিসত্তার শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশের মত স্বাধীন দেশের উত্থান হয়। এর পিছনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল পাকিস্তানের বঞ্চনা, ব্রিটিশরা অতি সাধারণ বাণিজ্যিক বেশে এদেশে আসলেও তাদের চলে যাওয়াটা ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। তার আসার সময় অখণ্ড ভারতে আসলে ও যাবার সময় তা খণ্ড বিখণ্ড করে রেখে যায়। আর ভারত খন্ডিত হবার সকল রসদ তারাই যুগিয়েছিল। কারণ তারাই পরোক্ষভাবে হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করে। তারা হিন্দু মুসলিম সাম্প্রীতিকে ভয় পেত যদি সম্মেলিত আন্দোলন তাদের পতন ঘটায়। পরবর্তী সময়ে ভারত বিভাগের পর এই সম্প্রীতি আর গড়ে উঠেনি; বরং তা চরাই উতরাই পেরিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে আজো টিকে আছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী মুসলিম নেতা মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর নিকট অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব ভালভাবে গ্রহণ করেননি। এছাড়া সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ও অবাঙালি নেতাগণ এ প্রস্তাবের কঠোর বিরোধীতা করে। যার ফলে বাংলা বিভক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারাই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হয়েছিল।

PREPARED BY-
AFRAN AISHA
FINANCE & BANKING DEPARTMENT
INSTRUCTOR, *BBA VISION*

BBA VISION

BBA VISION